ছন্দ হিন্দোল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি পরিচিতি

কলকাতার কাছেই নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন কলকাতা শহরেই অতিবাহিত হয়।

অনেক বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যুৎপত্তি ছিল। পাণ্ডিত্যের একটি প্রবল ঝোঁক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের ছাপ অনেক কবিতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, তাঁর অনেক কবিতাই রস সঞ্চারের পরিবর্তে তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তখন আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের বাইরেও একটি স্বতন্ত্র কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; যে কারণে, তিনি বাংলা কাব্য জগতে সমাদৃত হয়ে আছেন। তাঁর কবিতা শব্দ নির্মাণ কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কবি তাঁর কবিতায় ইন্দ্রিয় লব্ধ যে সুন্দর, সুকুমার ও সূক্ষ্ম অনভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে কবিতাকে পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে প্রায়ই তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। হৃদয়াবেগের চাইতে তিনি মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও চিন্তার প্রাধান্য বিস্তার করে কবিতা রচনা করতেন। ফলে, তার কবিতা অনেক ক্ষেত্রে তথ্য ও বুদ্ধির খেলায় ভারাক্রান্ত। কবিতায় তিনি চোখের দেখা ও কানের শোনা এ দুটির প্রতি অত্যধিক মাত্রায় খেয়াল রাখতেন। ফলে, তাঁর দেখার বস্তু ও শোনার বিষয়কে শব্দের অলংকারে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির ও জীবনের নানান রূপ তিনি যেমনটি দেখেন; ঠিক তেমনিভাবে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা গেঁথে কবিতার মালা নির্মাণ করেছেন। তার কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত গভীর অনুভূতি প্রকাশের অভাব থাকলেও রূপ ও ছন্দের অপূর্ব প্রকাশে তিনি প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁর এ অসাধারণ নৈপূণ্যের জন্য তিনি ছান্দসিক কবি হিসাবে বাংলার কাব্য জগতে পরিচিত।

সাধারণ মানুষকে নানাভাবে তিনি তাঁর কবিতার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মমতা তৎকালীন বাংলা কাব্য জগতের একটি বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর কাব্যের উপজীব্য; তেমনি আবার অতি সাধারণ দেশজ শব্দ, বিলুপ্ত প্রায় শব্দ ব্যবহার করে তিনি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বহু আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের প্রাণশক্তি আবিস্কারের অন্যতম কীর্তিমান কবি হিসাবে পরিচিতির স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য। শব্দের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দুর্বলতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করেছে। শুধু ছন্দ ও শব্দের আকর্ষণের কারণে অনাবশ্যক ও অযথা শব্দ প্রয়োগে কবিতাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদের পথিকৃৎ হিসাবে তিনি স্বীকৃত। তিনি আরবি, ফার্সি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ও উপমহাদেশের বহুভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। তীর্থরেণু, তীর্থ সলিল, ভুলের ফসল তার অন্যতম অনূদিত কাব্য গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে, সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, তীর্থ সলিল, তীর্থরেণু, ভুলের ফসল, কুহু ও কেকা, মণি -মঞ্জুষা, অভ্র আবীর, বেলা শেষের গান বিদায় আরতী প্রধান। তাঁর 'কাব্য সঞ্চয়ন' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ আছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বাংলা কাব্যসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান সম্পর্কে জানবেন।
২. কবির ভাষারীতি, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিতার বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ষার কলহাস্যময় পরিবেশকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দের তালে তালে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্র যেন অস্থির হয়ে ওঠে। বৃক্ষে, পুষ্পে, ঘাসে ঘাসে জলকণার বিন্দুর মাঝে বুঝি আনন্দ অশ্রুর খেলা। তাপদগ্ধ পৃথিবীর শুষ্কতা থেকে জলসিক্ত ধরনী যেন নবপ্রাণের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে যেন হাসির জোয়ার। খাল-বিল, নদী-নালা জল প্রবাহের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে থৈ থৈ ভাসমান মাঠ-ঘাট। বর্ষার রিম-ঝিম অবিরাম বর্ষণের মধ্যে যেন সুমধুর সুরের মুর্ছনা। সমগ্র বর্ষার রূপটিকেই কবি ছন্দোময় আনন্দের স্নিগ্ধ প্রকাশ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আবছা আলোয় বর্ষার প্রাকৃতিক পরিবেশকে কবির কাছে মনে হয় যেন, প্রিয়ার কাজল কালো আঁখির মুগ্ধ চাহনি।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- এ পাঠটি পড়ে বর্ষার পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ পাঠে বর্ণিত বর্ষার চঞ্চল পরিবেশের কথা লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মুলপাঠ
মেঘ্‌লা – মেঘে ঢাকা, মেঘময় **ইন্দু** – চাঁদ **সিন্ধু** – সমুদ্র **হেম-কদম্ব** – সোনালী রং এর কদম ফুল **তৃণ-স্তম্ভে** – তৃণ বা ঘাসের ডাঁটা **হর্ষের** – আনন্দের, উৎফুল্লের **মৌন** – নীরব, নিঃশব্দ **মগ্ন** – বিভোর, তন্ময় **খঞ্জন** – চঞ্চল স্বভাবের এক প্রকার ছোট পাখি **মন্থন** – আলোড়ন, মথিত করা **অঞ্জন** – চোখের কাজল, সুর্মা **নেত্র** – চোখ	মেঘ্‌লা থম্ থম্ সূর্য-ইন্দু ডুব্‌ল বাদ্‌লায় দুল্‌ল সিন্ধু! হেম্-কদম্বে তৃণ-স্তম্ভে ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রু বিন্দু! মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন, মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন! দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন!
টিকা **স্নিগ্ধ-অঞ্জন** – মসৃণ, মধুর কাজল যেন পৃথিবীর চোখে একে দেয়া হয়েছে বর্ষার	

রূপের মাধুর্য বোঝানোর জন্য।	

ভাবসংক্ষেপ

মেঘ মেদুর আকাশে চন্দ্র-সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। তৃণ, পুষ্প, কদম্বের পাপড়িতে বর্ষার জল কণা যেন আনন্দের অশ্রুবিন্দু। সমুদ্র ও মেঘমালা নিয়ত আলোড়িত হচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা খঞ্জন পাখি নৃত্যরত। বর্ষার অনাবিল রূপে যেন মুগ্ধতার কাজল পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বর্ষার সমুদ্রের অবস্থা কী রূপ ধারণ করে?
২. বৃক্ষ ও পুষ্পেকী অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে?
৩. বর্ষার রূপ সম্বন্ধে এ দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলি নিজের কথায় লিখুন।
৪. বর্ষার আকাশের রূপ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বর্ষার সমুদ্রের অবস্থা কী রূপ ধারণ করে?
উত্তর : বর্ষার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। মেঘ-তাড়িত বায়ুর আঘাতে সমুদ্র গর্জন করতে থাকে। উত্তাল সমুদ্রকে যেন বায়ু নিরন্তর মন্থনে অস্থির করে রাখে।

প্রশ্ন : বৃক্ষ ও পুষ্পেকী অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে?
উত্তর : ঘনঘোর বর্ষার বর্ষণে বৃক্ষের পাতা সিক্ত থাকে। বর্ষার বৃক্ষ যেন গাঢ় সবুজের ছোঁয়ায় অপরূপ রূপ ধারণ করে। ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা জল কণাকে যেন মনে হয় আনন্দের অশ্রু বিন্দু।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

মৌন নৃত্যে .....
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঙ্গন।

আলোচ্য অংশটি ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ছন্দ হিন্দোল" কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
বর্ষার প্রাকৃতিক রূপ পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনের রূপ মাধুরীর বর্ণনা কবি এ প্রসঙ্গে প্রদান করেছেন। গ্রীষ্মের তাপ-শুষ্ক ভয়াল পরিবেশের পর বর্ষা তার সিগ্ধ বর্ষণের সিক্ততা নিয়ে আসে। প্রকৃতির সব কিছু যেন নিমেষে ছেয়ে ওঠে। আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। অবিরাম রিমঝিম সুরের মূর্চ্ছনায় অঝোরে বৃষ্টি নামে। চন্দ্র-সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যায়। নদী সমুদ্র ফুলে ওঠে। সমুদ্র বাতাসের তাড়নায় উত্তাল রূপ ধারণ করে। ফুলে, তৃণে বৃষ্টি বিন্দু ঝলমল করে। জলসিক্ত বৃষ্টি বিন্দুকে যেন আনন্দের অশ্রু বলে মনে হয়। খঞ্জন পাখি আনন্দ নৃত্যে মেতে ওঠে। প্রকৃতির বিচিত্র নয়ন জুড়ানো রূপে যেন মুগ্ধ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কাজল পরিয়ে দেয়া হয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনের চিত্রটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ষার আনন্দের রূপটি আপনি কবিতার অনুসরণে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ষার প্রাকৃতিক রূপের কথা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
চিত্তের-নন্দন – মনের আনন্দ **গৈরী** – পর্বত সম্ভূত (গৈরী নি:শ্বাস) **চন্দন** – বৃক্ষ বিশেষ, এ বৃক্ষের কাঠ সুগন্ধীযুক্ত **সান্দ্র** – অবিচ্ছিন্ন, ঘন **হর্ষ** – আনন্দ, পুলক **কল্লোল** – শব্দকারী তরঙ্গ, কলরব **হিল্লোল** – তরঙ্গ, দোলন **মঞ্জু** – সুন্দর, মনোহর	গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস। লাগছে গায়-কার গৈরী নিঃশ্বাস! চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিগ্‌পাশ। ভাসছে বিল খাল ভাস্‌ছে বিলকুল্! ঝাপসা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁই ফুল! ধান্য শীষ্ তার কর্‌ছে বিস্তার– তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল! সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল! ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল! মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার- মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিল্লোল!

ভাবসংক্ষেপ

গ্রীষ্মের দুঃসহ গরমের পর, প্রকৃতি শান্ত , শীতল, জলপ্রবাহের স্নিগ্ধতা নিয়ে উপস্থিত হয়। তাপদগ্ধ ধরনী যেন মেঘ মেদুর আকাশের সুশীতল বর্ষণে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। থৈ থৈ জলে খাল-বিল ভাসতে থাকে। ধানের শীষ জলের ওপর মাথা উঁচু করে অবিরাম দোল খায়।

প্রকৃতির চারিদিকে আনন্দের বান ডেকে যায়। বর্ষণের সুমধুর ধ্বনি যেন বীণার তারের ঝঙ্কার। ঝিল্লির অবিরাম গুঞ্জনে বুঝি সুরের সুষমায় ভরা মধুর ধ্বনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনে প্রকৃতি কী রূপ ধারণ করে?
২. বর্ষার আকাশ কেমন থাকে?
৩. 'মুর্চ্ছে বর্ষারছন্দ হিল্লোল' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৪. নিশ্বাস ও 'জুল্‌জুল' শব্দ দুইটির বিভিন্ন প্রয়োগে বাক্য লিখুন।
৫. নিম্ন লিখিত শব্দগুলি থেকে তদভব ও তৎসম শব্দসমূহ বাছাই করে লিখুন ঃ শাপলা, নিঃশেষ, ঝাপটা, ধান্য, বর্ষা, বন্যা, হর্ষ।

প্রশ্ন : গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনে প্রকৃতি কী রূপ ধারণ করে?

উত্তর : বর্ষা কালের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। প্রকৃতি জুড়ে আসে আবছা আলো-আঁধারের খেলা। চন্দ্র-সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। চারিদিকে থমথমে ভাব ও মেঘের অবিরাম আনাগোনা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামে।

প্রশ্ন : বর্ষার আকাশ কেমন থাকে?

উত্তর : বর্ষার বর্ষণে একটি ছন্দোময় সুর আছে। ধরণীর পৃষ্ঠে, জলাধারে, ঘরের চালে, গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টি ফোটা অপরূপ ছন্দের মায়াজাল সৃষ্টি করে। একটানা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মাধুর্য মনোমুগ্ধকর। বর্ষার এ নিজস্ব সুরের ঝর্ণ ধারা প্রকৃতির বুকে ও দোলা লাগে। ঝিল্লির রব বর্ষার সুরধ্বনির সংগে মিশে একটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এমনি পরিবেশে বীণাকার ও বীণার তালে ঝংকার তোলেন; মনে হয় যেন যন্ত্র আর প্রকৃতি একই সুরে কথা কয়। বর্ষার প্রকৃতির মধ্যেই যেন ছন্দের এক সঙ্গীতময় দোলার লয় বিদ্যমান।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতায় অংকিত বর্ষার রূপ নিজের ভাষায় লিখুন।
২. 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

প্রশ্ন : ছন্দ-হিন্দোল' কবিতায় অংকিত বর্ষার রূপ নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে বর্ষা একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। ফলে এদেশের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকের রচনায় বর্ষা ঋতুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচ্য কবিতায় শব্দ ও ধ্বনির বিচিত্র প্রকাশে বর্ষার এক মায়াময় চিত্র অংকন করেছেন।

বর্ষার এদেশের মানুষের কাছে বহু প্রত্যাশিত ঋতু। প্রকৃতি তার চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনের আকাশ মানুষের মনে ও সাড়া জাগায় - আনন্দ বিলায়।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদগ্ধ মেঘহীন আকাশ বর্ষার আগমনে উধাও হয়ে যায়। ঘন আঁধার করে আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। জলশূন্য উত্তপ্ত ধরনী বৃষ্টির স্পর্শে সিক্ত হয়ে ওঠে। খাল-বিল, নদী-নালা জলের তোড়ে ভাসতে থাকে। মেঘে ঘেষে চন্দ্র সূর্য ঢাকা পড়ে। চারিদিকে থম থমে ভাব। গুরু গুরু মেঘের গুঞ্জন। মেঘেরা উড়ে যায় পাহাড়ী বাতাসের হালকা আমেজে। দুগ্ধ ধবল সৃষ্টির ধারা চন্দনের মত স্নিগ্ধ।

বর্ষার সমস্ত প্রকৃতির গায়ে সজীবতার আভাস লাগে। সবুজ, সতেজ তৃণ, বৃক্ষ, পাতা, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কদম ফুলের সোনালি পাপড়িতে জমে থাকা জলকণা যেন সদাহাস্য ময়। অবিরাম বৃষ্টির ধারায় প্রকৃতি মধুর রূপ ধারণ করে। বৃষ্টির মধুর স্পন্দনে হৃদয় পুলকিত হয়; স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে জুঁইফুল হেসে ওঠে।

বর্ষার আগমনে খাল-বিল জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন পৃথিবীর জলের ওপরে ভাসমান। মাঠ-ঘাট বন্যার জলে একাকার হয়ে যায়; ধানের শীষগুলো কখনো ভাসে, কখনো বা ডুবে যায়।

বর্ষার ঘন ঘোর অবিরাম বর্ষণে মানুষের মনে ও প্রভাব বিস্তার করে। অঝোরে বর্ষার নিবিড়তায় প্রকৃতি যেন একাকার হয়ে যায়। ঝিল্লির মধুর গুঞ্জনে পরিবেশ যেন মুখর হয়ে ওঠে। বীণাকার তার বীনায় ঝংকার তোলে - সেই সুর লহরীর মাধুর্য যেন বর্ষার প্রকৃতির সংগে একাকার হয়ে এক মোহময় আবেশ সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. গ্রীষ্ম নিঃশেষ ..... ভাসছে দিগ্‌পাশ।

আলোচ্য কবিতাংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ হিন্দোল' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
গ্রীষ্মের অবসানে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের চিত্র এখানে বিধৃত হয়েছে।
শুষ্ক, শূন্যতা আর দাবদাহের ঋতু গ্রীষ্ম। জলশূন্য খাল-বিল যেন এক রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। চারিদিকে উদাস করা হাহাকার। এমন সময়ে বর্ষা আসে জলভরা মেঘের শীতল ছায়া নিয়ে। জলশূন্য মাঠ-ঘাট, খাল-বিল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ষণসিক্ত প্রকৃতি স্নিগ্ধতায় শিহরণে আনন্দে উদ্বেল হয়। চন্দন চর্চিত স্নিগ্ধ মাধুর্যের ছোঁয়া লাগে বাদলের ধারায়। মানুষের মনেও বর্ষণ মুখর প্রকৃতির দোলায় আবেশ সৃষ্টি করে।

খ. সান্দ্র বর্ষণ ..... ছন্দ হিল্লোল।

সৃজনশীল কাজ

১. আপনার দেখা বর্ষা ঋতুর বর্ণনা লিখুন।
২. একটি বৃষ্টি মুখর দিন সম্বন্ধে নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. বর্ষায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর একটি রচনা লিখুন।
৪. বর্ষা আমাদের জীবনে যেন আশীর্বাদ স্বরূপ; তেমনি আবার অভিশাপ বয়ে আনে। - এ সম্বন্ধে আপনার মতামতসহ একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের "আষাঢ়" কবিতাটি পাঠ করুন। কবিতাটি ক্ষণিকা কাব্যের অন্তর্গত।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্য কবিতা সংগ্রহ করে পড়ুন।

খেয়া-পারের তরণী

কাজী নজরুল ইসলাম

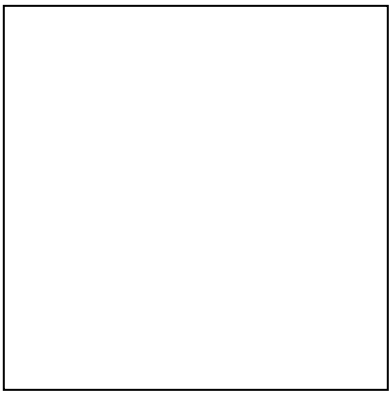

কবি পরিচিতি

কাজী নজুরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দু'জনকেই হারান। শৈশব থেকে দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে তিনি আকৃষ্ট হননি। স্কুল পালিয়ে কিছুকাল গ্রাম্য 'লেটো' গানের দলে কবিয়ালী করেছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাউকে কিছু না বলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচীতে চলে যান।

যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিখ্যাতি তখন থেকেই বিস্তৃত হতে থাকে। পরাধীনতার গ্লানি এবং শাসক শোষকদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদের কারণে কারাবরণ করেন। এ কারণেই বিদ্রোহী কবি হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হন।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ মূলত কবি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি যখন মধ্যগগণে তখনই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়েছেন। তিনি সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সেই সঙ্গে রাজনীতিকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজদের শাসন এবং শোষণকে কাব্যরূপ দিয়ে নিজেকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। তাঁর প্রধান প্রধান রচনাবলীর কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, দোলন চাঁপা, চক্রবাক, ছায়ানট প্রভৃতি।

গল্প ও উপন্যাস : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলী মালা, বাঁধনহারা, কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধা।

প্রবন্ধ : যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, কাব্যে আমপারা।

গান ও স্বরলিপি : বুলবুল ১ম ও ২য় খণ্ড, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, সুরসাকী, জুলফিকার, বনগীতি, গুলবাগিচা, গানের মালা, গীতি শতদল, নজরুল গীতিকা, নজরুল স্বরলিপি, স্বরলিপি প্রভৃতি।

পত্রিকা সম্পাদন : দৈনিক নবযুগ, ধুমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি।

নজুরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্তহন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ভূমিকা

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২৩) থেকে 'খেয়া পারের তরণী' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি রচনার পেছনে একটি প্রেরণা কাজ করেছে। ঢাকার নবাব পরিবারের একজন মহিলা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় একটি ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ছবির বিষয়বস্তু ছিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে একটি নৌকা এগিয়ে চলেছে, যার চারটি দাঁড়ের মাথায় ইসলামের চার খলীফার নাম এবং হালের মাথায় ও পালে হযরত মুহম্মদ (স) এর নামসহ 'শাফায়াৎ' শব্দটি লেখা ছিল। এ ছবিটিই কবিকে কবিতাটি লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

কবিতাটিতে একই সঙ্গে তৎসম এবং আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর লেখায় হিন্দু পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্য পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. ধর্মীয় আদর্শকে বাংলা কবিতায় ব্যবহারের নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন।
৩. নজরুলের কবিতায় শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দুর্যোগপূর্ণ রাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- খেয়াপারাপার এবং কেয়ামত রাতের প্রকৃত অর্থ এবং রূপক অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খেয়াপারের পাপী যাত্রীদের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
খেয়াপারের তরণী – নদী পারাপারের নৌকা **রাত্তিরে** – রাত্রে। ছন্দের কারণে রাত্তিরে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। **বজ্রেরি** – বজ্রপাতের। সংস্কৃত শব্দ। **তূর্যে** – ভারতের প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। এখানে বজ্রপাতের শব্দ। **গর্জিছে** – গর্জন করছে। সাধারণভাবে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়না কিন্তু কবিতায় করা যায়। **প্রলয়** – সৃষ্টির বিনাশ। সম্পর্ণ ধ্বংস। **বিষাণ** – শিঙ্গা। সং **ঝঞ্ঝা** – প্রবল ঝড়বৃষ্টি। **ঘন দেয়া** – ঘন মেঘ। **স্বনিল** –শব্দ করল। (স্বন+ইল) সং **ঈশান** – উত্তর-পূর্বকোণ।	যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার, বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার? প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে? ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে! নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ! মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ! নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে! তমসাবৃতা ঘোর 'কিয়ামত' রাত্রি, খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী! দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী, শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

পাপ-সিন্ধু – পাপের সমুদ্র। পাপ রূপ সিন্ধু রূপক কর্মধারয় সমাস।

তুঙ্গ – উচু। সং

তরঙ্গ – ঢেউ। সং

মহানিশা – মহারাত্রি। অন্ধকারের গাঢ়তা বোঝাবার জন্য নিশার পূর্বে মহা বিশেষণটি যোগ করা হয়েছে।

সিন্ধু – সমুদ্র।

রুদ্র – প্রকৃত অর্থ শিবের ভয়াবহরূপ। এখানে ঝড়ের ভীষণ রূপ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

নিশাচর – রাতে যেসব প্রাণী বিচরণ করে।

গ্রাসে – গিলে ফেলে।

মহাবিশ্ব – বিশাল পৃথিবী।

ত্রাসে – ভয়ে।

নিঃস্বে – সম্বলহীন।

তমসাবৃত – (তমস+আবৃত) তমস শব্দের অর্থ অন্ধকার। আবৃত-আচ্ছন্ন।

দমকি্ দমকি – থেকে থেমে।

শিঙ্গা – ইসলাম ধর্মমতে ফেরেশ্তা ইস্রাফিল (আঃ) সৃষ্টির প্রথম দিন শিঙ্গা বাজিয়েছিলেন। শিঙ্গা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পেলেই আবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, সেদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে কেয়ামত রাত বোঝাবার জন্য শিঙ্গা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হুঙ্কার – গর্জন করা।

যামিনী – রাত।

কেয়ামত

ইসলাম ধর্মমতে পৃথিবী যেদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হবে, সেই দিনকেই কেয়ামত বলা হয়। এটি একটি আরবি শব্দ।

যাত্রী

সাধারণ অর্থে কোথাও যাবার জন্য যারা গমন করে তাদেরকে যাত্রী বলে।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র –ঝড়ে উত্তাল সমুদ্র।

খেয়া পারের তরণী

সাধারণ অর্থে যে নৌকা নদীর এপার থেকে ওপারে যাত্রী পারাপার করে। এখানে ইহকাল বা পৃথিবীর জীবন থেকে পরকালে যাবার মাধ্যম হিসেবে ইসলাম ধর্মকে খেয়া পারের তরণী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ পার্থিব জীবন যেন নানা বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ একটি মহাসমুদ্র। এ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেহেশতে

যাবার রাস্তা তৈরি করাই মানব জীবনের লক্ষ্য। ধর্মরূপ তরণী হল সেই পারাপারের মাধ্যম।	

ভাবসংক্ষেপ

অন্ধকার প্রলয়ের রাতে যাত্রীরা খেয়াপার হতে এসেছে। কিন্তু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর উত্তাল অবস্থা দেখে পাপী যাত্রীরা ভীত হয়ে আশঙ্কা করছে। যে কোন সময় এ তরণীটি ডুবে যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। যাত্রীরা কখন খেয়াপার হতে এসেছিল? সমুদ্রের অবস্থা তখন কেমন ছিল?

২। কবি এখানে কেয়ামত রাত্রির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : খেয়াপারের তরণী কবি নজরুল ইসলামের একটি রূপক কবিতা। আমরা জানি রূপক কবিতা একই সাথে দু'টি অর্থ বহন করে। এখানে কবি মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কারণ খুঁজতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেই প্রধান রূপে চিহ্নিত করেছেন। কবি এখানে সাধারণ অর্থে ইসলাম ধর্মমতে কেয়ামত রাত্রি পাপীদের কাছে কেমন ভয়াবহ হবে সেই চিত্র বিষয় অনুসারে শব্দ ব্যবহার করে সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন।

যাত্রীরা রাত্রিবেলা খেয়াপারের জন্য উপকূল ভূমিতে সমবেত হয়েছে। কিন্তু তখন ঈশান কোণে প্রগাঢ় মেঘ জমেছে। প্রবল বেগে বাতাস বইছে এবং অবিরাম বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো সিংহের গর্জনের মত উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন হিন্দুদের দেবতা শিব তার প্রলয় নৃত্য শুরু করেছেন। এ বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস করাই এখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইস্রাফিল অচিরেই যেন তাঁর মহাশিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জগতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছেন। পাপী তাপী যাত্রীরা সমুদ্রের এ ভয়াবহ রূপ দেখে শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েছে। বজ্রপাতের সঙ্গে বিদ্যুতের চমক, সমুদ্রের গর্জনে কম্পিত পৃথিবী, বাতাসের গর্জনে সমস্ত কিছু যেন কেয়ামত রাতকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। পাপীরাই কেয়ামতকে ভয়াবহরূপে প্রত্যক্ষ করবে। কারণ তাদের জীবনপথে পাথেয় যে ধর্মপথে থেকে পুণ্যসঞ্চয় তা তাদের নেই। তাই খেয়াপারের জন্য মনোবলের দরকার তাও তাদের নেই। লেখক এ পৃথিবীকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। কবির ধারণা ইসলামের পথ থেকে আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণেই মুসলিম জাতি আজ দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে। কেয়ামত রাত্রির রূপকের আড়ালে কবির এ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে।

৩. দুর্যোগপূর্ণ রাত সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটিপড়ে আপনি–

- পুণ্য পথের যাত্রীরা কেন ভয়ঙ্কর ঝড়েও সমুদ্রকে ভয় পাচ্ছে না, তার কারণ লিখতে পারবেন।
- এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা তাঁদের নাম লিখতে পারবেন।
- তরণীটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছালে কারা এবং কেমন করে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
লঙ্ঘি – পার হয়ে।	লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে

ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে–
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহ্‌মদ, তরী ভরা পাথেয়!

আবুবকর উসমান ওমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ্!

'শাফায়ত' -পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

নির্ভীক চিত্তে – ভয়হীন হৃদয়ে।
জলধি – সমুদ্র। তৎসম শব্দ।
ভৈরব – হিন্দুদের দেবতা।
শিবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। এখানে ভীষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎসম (ভীরু+অ) = ভীরুদের আশঙ্কাস্থল।
ডঙ্কা – যুদ্ধে জয়ের ঢাক।, তৎসম।
ওঙ্কার – হিন্দুদের দেবতা ব্রহ্মার শব্দ-প্রতীক। হিন্দু ধর্মের লোকেরা এ মন্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরের আরাধনা করেন।
তর্জন – ক্রোধ।
পুণ্যপথ – পাপহীন, পবিত্র পথ।

বর্ম – অস্ত্রের আঘাত থেকে শরীর রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরার আবরণ বিশেষ।
দিল – হৃদয়। ফার্সি শব্দ।
সাফ – পরিষ্কার। ফার্সি শব্দ।
নিপাত – পতিত।
কাণ্ডারী – চালক, মাঝি, নেতা আহমদ – ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স)। আরবি শব্দ।
পাথেয় – পথের সম্বল।
সারিগান – নৌকার মাঝিরা সারি বেধে বসে বৈঠার তালে তালে যে গান করে আর নৌকা চালায়।
লা-শরীক আল্লাহ – আল্লাহর কোন শরীক বা অংশীদার নাই অর্থাৎ আল্লাহ এক।
শাফায়াত – সুপারিশ করা। এটি আরবি শব্দ।
মাস্তুল – পালের স্তম্ভ।
জান্নাত – স্বর্গ, বেহেশত; আরবি শব্দ।
হুরী – বেহেশত বাসিনী সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরী। আরবি।
শির – মস্তক, মাথা আরবি।
মঙ্গল-দাত্রী – কল্যাণ দায়িনী।

টীকা

আবু বকর

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী। ইসলামের সেবায়, দান দাক্ষিণ্যে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ওমর

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। ন্যায়বিচার,

প্রজার বাৎসল্য, সুশাসন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য সকল মানুষের জন্য তিনি আদর্শ।

উসমান
মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা।

আলী
মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জামাতা। শক্তিশালী সাহসী যোদ্ধা। তাঁর উপাধি ছিল হায়দার বা তরবারি।

দাঁড়ী যে এ তরণীর
এ খেয়া নৌকাটির দাঁড়ী হলেন ইসলামের প্রথম চার খলীফা। এ কারণেই নৌকার যাত্রীরা নির্ভীক। কবি এখানে ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাসকে কাব্যরূপ দিয়ে অভয় দিচ্ছেন– নব জাগরণের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন।

কান্ডারী
মাঝি, নেতা। এ পুণ্য তরীর নেতা আহ্মদ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (স) এর মাঝি।

ভাবসংক্ষেপ

ঝড় এবং বজ্রপাতে মুখর উত্তাল সমুদ্রের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে একটি নৌকা দ্রুতবেগে পার হয়ে যাচ্ছে। এ নৌকার চালক স্বয়ং হয়রত মুহম্মদ (স) এবং দাঁড়িরা হলেন ইসলামের চার খলীফা। এ নৌকার মাস্তুলে লেখা আছে 'শাফায়ত' অর্থাৎ শেষনবী এ নৌকার যাত্রীদের জন্য সুপারিশ করছেন। বেহেশ্তবাসী কল্যাণকামী হুরীরা তাই এ নৌকার ওপর পুস্পবৃষ্টি করছেন। দাঁড়িরা আল্লাহর বাণী 'লা-শরিক আল্লাহ' সারিগানের মত গাইতে গাইতে অবশেষে নির্ভয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. একটি তরণী কেমন করে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে?
২. 'কাণ্ডারী আহমদ' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৩. এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা?
৪. তরণীটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুলে কারা এবং কেমন করে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাল?

২. পুণ্য পথের যাত্রীরা কেন প্রলয়ের রাতকে ভয় পাননি?

উত্তর : ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও একটি নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলেছে। নৌকার যাত্রীরা শত বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকেরও ভীত নয়। কেননা তারা ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার একত্বে বিশ্বাসী মহানবী (স) প্রদর্শিত পথই তাদের পথ। ধর্মের বর্মে তারা তাদের আত্মক আবৃত রেখেছে, কলুষিত হতে দেয়নি। কবি মনে করেন উত্তাল সমুদ্রের রূপ পৃথিবীর সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারাই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে যারা কোরআনের নির্দেশিত পথে চলেছে। এ পথের পথ প্রদর্শক স্বয়ং মহানবী (স) তাঁর সহযোগরা হলেন ইসলামের চার খলীফা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী। পুণ্যপথের যাত্রীরা তাই প্রলয়ের রাতকে ভয় পাননি।
এখানে উত্তাল সমুদ্র হিসাবে ইহলৌকিক বা পার্থিব জীবনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইহজগতে চলার জন্য ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন পথ নেই। এ নিরাশাগ্রস্ত পথহারা মুসলিম জাতির চেতনায় কবি এ অভয় মন্ত্র সৃষ্টির প্রেরণায় পুণ্যাবানদের তরণীর রূপকটি চিত্রিত করেছেন।

৪. এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা?

উত্তর : এ পুণ্য তরণীর মাঝি আহ্মদ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (স)। আর বই তরণীর দাঁড়ি হলেন ইসলামের চার খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী। এ কারণেই নৌকার যাত্রীরা নির্ভীক।

চূড়ান্তমূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "খেয়া পারের তরণী' কবিতার মূল ভাববস্তু লিখুন।
২. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কবি রূপকের মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৩. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম এবং আরবি-ফার্সি শব্দগুলো চিহ্নিত করুন।
৪. সমুদ্র এবং রাত্রির প্রতিশব্দগুলো লিখুন।
৫. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন :
   ক) নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে
      ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।
   খ) তমসাবৃতা ঘোর কিয়ামত রাত্রি,
      খেয়াপারে আশা নাই ডুবিলরে যাত্রী।
   গ) পুণ্য পথের এযে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
      ধর্মেরি বর্মে সুরক্ষিত দিল্‌সাফ্।
   ঘ) কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
      দাঁড়ি মুখে সারি গান - লা শরীক আল্লাহ্।
   ঙ) 'শাফায়াত'- পাল বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
      'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।

প্রশ্ন : 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতার মূল ভাববস্তু লিখুন।

উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী' ইসলামি উজ্জীবনের ধারায় লিখিত একটি রূপক কবিতা। কবি ইসলামপন্থী ও ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি সম্পর্কে কবিতাটিতে আলোকপাত করেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে কবিতায় 'খেয়া-পারের নৌকা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে, উত্তাল সমুদ্র, ঈশানকোণে ঘনমেঘ জমেছে। ভয়াবহ এ ঝড়ের রাতে যাত্রীরা এসেছে খেয়া পারের আশায়। কিন্তু প্রকৃতির এ ভয়াবহ রূপ দেখে তারা ভীত। পাপাত্মদের হাহাকারে বিশ্বচরাচর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পাপীযাত্রীরা এ ভয়াবহ সমুদ্র পাড়ি দেবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে একটি তরণীর যাত্রীরা এ উত্তাল সমুদ্র, বজ্রপাত, বিদ্যুৎচমক এবং ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যদিয়ে দ্রুতবেগে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ পুণ্য বানযাত্রীদের পথ প্রদর্শক স্বয়ং মহানবী (স) এবং তাঁর সহযোগী ইসলামের চার খলীফা। তাই এ তরণী সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামের আলোয় যাদের জীবন দীপ্তিময়, যাদের মুখে রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর নাম, তারা কোনো কিছুকে ভয় পাননা। অপরপক্ষে ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে যারা বঞ্চিত তাদের ভয়াবহ পরিণতি কবিতায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।
'খেয়া-পারের তরণী' একটি রূপক ধর্মী কবিতা। কবি এখানে উত্তাল সমুদ্র হিসেবে ইহলৌকিক জীবনকে চিহ্নিত করেছেন। এ সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য অর্থাৎ ইহজগতে চলার জন্য ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন পথ নেই। কবিতার মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ইসলাম প্রদর্শিত পথই মুসলমান জাতির অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরে পাবার একমাত্র পথ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নিঃশেষ নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।

আলোচ্য অংশটুকু কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি মহাবিশ্বের সমগ্র পাপী সমাজের করুণ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন।
এ পৃথিবীতে যারা ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত তাদের কাছে কেয়ামত ভয়ঙ্কর রাত হিসেবে দেখা দেবে। মিথ্যা, অসত্য, অন্যায় ও অনাচার মানব জীবনকে শুধু আচ্ছন্নই করেনি, তাদের যাত্রাপথকে করেছে স্তব্ধ। চারদিকে পাপের আবেষ্টনী থেকে মানুষ মুক্তি চায়। পাপ সিন্ধুর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ রূপ রুদ্র কালরাত্রি মানুষকে মহা সঙ্কট ও ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কবি মনে করেন নিশাচর হিংস্র প্রাণীরা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। এ দুর্যোগপূর্ণ দুর্দিনে পাপীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। প্রলয় সমুদ্র অতিক্রম করে আত্মরক্ষার পথ পাপীরা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ পাপ সমুদ্র পাড়ি দেয়া পাপীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পাপাত্মরূপ যাত্রী নৌকাটির ধ্বংস অনিবার্য।
দিক্‌দিগন্তবজ্রণী বিদ্যুতের গর্জনে কম্পমান। নিশাচর প্রাণীরা যেন নিমেষেই সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। এমনই মুহূর্তে পাপীদের পারাপারের কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ শেষ পারাপারের জন্য কোন পুণ্য তারা সঞ্চয় করেনি। পাপী যাত্রীরা তাই মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কাঁপছে।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান- লা শরীক আল্লাহ্।

আলোচ্য অংশটুকু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ যে ইসলাম সে কথাটিই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঘোর দুর্যোগময় রাত। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী এ পাপ-সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ। আকাশে বজ্রপাতের বিকট শব্দ। পাপীদের নৌকা সে সমুদ্রের ডোবার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে যার ইসলাম প্রদর্শিত পথে জীবন কাটিয়েছে তারা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। কারণ এ খেয়াতরীর মাঝি হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স) স্বয়ং। এছাড়া এ তরীর দাঁড়িরা হলেন ইসলামের চারজন শ্রেষ্ঠ খলীফা। দাঁড়িদের মুখে আল্লাহর বাণী 'লা-শরিক আল্লাহ' সারী গানের মত উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে পাপ সমুদ্র, দাঁড়ি, মাঝিমাল্লা, কাণ্ডারী প্রভৃতি রূপকের মাধ্যমে কবি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল মানব জাতি যদি রসুলের নির্দেশ ও খলীফাগণের আদর্শকে নিজ জীবনে অনুসরণ করেন তবে ইহকাল ও পরকালে তাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার

একই ব্যঞ্জন ধ্বনি বার বার ব্যবহার করলে তাকে অনুপ্রাস বলে। এটি একটি শব্দালঙ্কার। এখানে 'ত' এবং 'র' একাধিক বার ব্যবহার করার ফলে ছন্দে একটি আলাদা দোলা সৃষ্টি হয়েছে।

আপনি দেখুন কবিতাটিতে এ অলঙ্কার আরও আছে কিনা। থাকলে তা চিহ্নিত করুন।

২। এ কবিতায় বহু তৎসম এবং বিদেশী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। আপনি সেগুলো নিচের অংশে লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন কাব্য। এগুলো পাবেন নজরুল রচনাবলীতে।

কবর

জসীমউদ্‌দীন

কবি পরিচিতি

ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ সালের পয়লা জানুয়ারি কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম হয়। পিতার নাম মৌলভী আনসারউদ্‌দীন। ১৯২৩ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ এবং বি.এ পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন ১৯৩১ সালে। বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন 'কবর' কবিতা। আর এ কবিতাই তাঁকে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই 'কবর' ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাঙলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই জন্য তাঁকে বলা হয় পল্লী কবি। নজরুল ইসলামের পর জসীম উদ্‌দীনই মুসলিম কবি হিসেবে ব্যাপক খ্যাতির সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি গান নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। কর্মজীবন শুরু করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করেন। 'রাখালী' তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এতেই 'কবর' স্থান পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবি জসীম উদ্‌দীনের কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম :

কাব্যগ্রন্থ : নকসী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩), মাটির কান্না (১৯৫১)।

নাটক : পদ্মাপার (১৯৫০), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া (১৯৫৯)।

গদ্যরচনা : বাঙালির হাসির গল্প (১৯৬০), জীবন কথা (১৯৬৪), জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫)।

ভূমিকা

জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' থেকে 'কবর' কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিতাটি কাহিনীধর্মী। বুড়ো দাদু তার একমাত্র পৌত্রের কাছে নিজের জীবনের গল্প বলছেন। এ গল্পের করুণ সজল বর্ণনা পাঠককে ব্যথিত করে। সহজ সরল ভাষায় দাদু প্রথমে স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, তাঁদের সুখের সংসার জীবনের কথা বলেছেন। তারপর একে একে বর্ণনা করেছেন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী এবং কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যুর ঘটনা। এক সময় ছিলো তাঁর সোনার সংসার। ছিলো মায়ার বন্ধনে সকলে বাঁধা। এখন সবই বুক ভেঙে যাওয়া স্মৃতি। মৃত্যুর শেষ চিহ্ন কবরগুলো দেখে বৃদ্ধের দিন কাটে। মনে পড়ে সুখের দিনের কতো কথা। মনে পড়ে প্রিয়জনদের শেষ কথাগুলো। কৃষক পরিবারের জোয়াল, লাঙল, বলদ, মাথালের নামগুলো কবিতায় এমন ভাবে উচ্চারিত হয়েছে যে মনে হয় ওগুলো পর্যন্ত চোখের পানিতে ভিজে আছে। কাহিনী বলতে গিয়ে সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করে যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা পড়ার সময় করুণ বেদনায় পাঠকের চোখও হয়ে ওঠে অশ্রু সজল। এখানেই কবির সার্থকতা। পাঠককে খুব সহজেই তিনি বৃদ্ধের সমব্যথী করে তুলেছেন। মনে হয় ডালিম গাছের ছায়া-ঘেরা সাধারণ মাটির কবরের পাশে বসে শোকাতুর হচ্ছে শ্রোতারা। 'কবর' কবিতার হৃদয় ছোঁয়া আবেদন আজো তাই ম্লান হয়ে আছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কবি জসীমউদদীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।

২. সহজ-সরল কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দাদুর বেদনা ও কষ্টের কারণ জানতে এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- দাদুর বর্ণনা থেকে দাদির চরিত্র বুঝতে ও লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
সোনালী ঊষা – সূর্য ওঠার আগে আকাশের পূর্বদিকে যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে তাকেই কবি সোনালী ঊষা বলছেন। ঊষাকাল হলো সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু।	এখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক। এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা, সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা। সোনালী উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি। যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত এ কথা লইয়া ভাবি সাব মোরে তামাশা করিত শত। এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
সোনারমুখ – সোনালী ঊষার মতো সুন্দর রঙভরা মুখ বা চেহারা।	
দেড়ী – দেড় সের।	
গাঁটে – কোমরে।	
বাটে – পথে।	
নথ – নাকের অলঙ্কার/গহনা।	
দোয়া মাঙ দাদু – দোয়া চাও দাদু।	
তরেতে – জন্য।	বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা "আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ"
ভেস্ত – বেহেশত।	শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
নাজেল – নেমে আসা।	পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরী।
কাফন – মৃতের পোশাক।	দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
গাড়িয়া – পুঁতে দেয়া।	সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
নাওয়ায়ে – ভিজিয়ে।	হেস না– হেস না– শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে, দাদী যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!

নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।

তারপর এই শূন্য জীবনের যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়– আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

ভাবসংক্ষেপ

বুড়ো দাদু নাতির কাছে তার জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। যে ডালিম গাছের নিচে বুড়োর স্ত্রীর কবর সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত সুখের স্মৃতির কথা মনে করছেন। ছোট্ট পুতুলের মতো লাল টুকটুকে বউ এনেছিলেন ঘরে। তিনি তখন স্বামী সংসার কিছুই বুঝতেন না। পুতুল নিয়ে খেলতেন। পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হয়ে যেতেন। এক সময় সেই ছোট্ট বউ স্বামী সংসার চিনতে শিখলেন। স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা ভরে গেলো সুখের সংসার। কোল আলো করে এলো ছেলে-মেয়ে। তখন তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েও থাকতে চাইতেন না। বউকে বাপের বাড়ি পাঠালে দাদুও অস্থির হয়ে যেতে কদিন পরই। হাট থেকে ফেরার পথে পুঁতির মালা, তামাক, মাজন ইত্যাদি ছোটো খাটো জিনিস নিয়ে বউকে দেখে আসতেন। স্বামীকে কদিন পর দেখে তিনি অভিমান করে কেঁদে বলতেন, কেনো এতোদিন পর এলে? দাদু তাই নাতিকে দুঃখ করে বলেছেন দুচার দিন স্বামীকে না দেখে যে থাকতে পারতো না, সে কেমন করে এখন কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে? তাছাড়া শুধু তো একটা মৃত্যু নয়, আরো অনেক আপন জনের মৃত্যু দেখেছেন তিনি। সেই শোক বহন করছেন তিনি তিরিশ বছর ধরে। প্রতিদিনই তিনি হারানো প্রিয়জনদের কথা ভাবেন, কাঁদেন আর দোয়া চান পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে। নাতিকেও দোয়া করতে বলছেন তার দাদির জন্য, তাঁকে যেনো আল্লাহ বেহেশতবাসী করেন। দাদুর কথায় তাঁর জীবনের যে করুন চিত্র এ অংশে প্রকাশ পেয়েছে তাতে পাঠকের চোখও হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। জীবনের বাস্তবতা যে কতো কঠিন, কতো কষ্টের, দাদুর কান্না জড়ানো কথায় তা যেনো ছবি হয়ে দেখা দেয় পাঠকের চোখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ডালিম গাছের তলে কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. সন্ধ্যে বেলায় শ্বশুর বাড়িতে কেনো যেতেন দাদু? কী কী নিয়ে যেতেন দাদির জন্য, সংক্ষেপে লিখুন

৩. 'পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে' কে বলেছেন, কেন এ কথা বলেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৪. মাটিতে বুক মিশিয়ে কেনো দাদু কাঁদতে চেয়েছেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ডালিম গাছের তলে কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

উত্তর : ডালিম গাছের তলে দাদু তাঁর স্ত্রীকে কবর দিয়েছেন, সেই কথা বলেছেন। নাতির কাছে দাদু তাঁর স্ত্রীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে বিয়ের সময় দাদির বয়স ছিলো খুব কম। সারাদিন পুতুল খেলা আর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। স্বামী সংসার কিছুই বুঝতেন না বরং পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হতেন। সেই ছেলে মানুষির কথা দাদুর মনে পড়ে। অনুভব করেন সেই পুতুলের মতো বউ-এর সুখ-স্মৃতির কথা। কিছুতেই ভুলতে পারেন না দাদু সেই 'সোনা মুখের' সুখি-সুখি চেহারা। দুঃখে বেদনায় প্রিয়জনের জন্য তখন কান্নাই তাঁর সান্ত্বনা হয়। তিরিশ বছর এভাবেই কাটিয়েছেন দাদু। দাদুর এ নিখাদ ভালোবাসার কোনো তুলনা দেয়া কষ্টকর।

প্রশ্ন : মাটিতে বুক মিশিয়ে কেন দাদু কাঁদতে চেয়েছেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

উত্তর : দাদু পেশায় কৃষক। মাটি চাষ করে ফসল ফলান। মাটি থেকে তিনি পান ফসল। কৃষক পরিবারের লোকদের কাছে মাটি তাই বড়ো প্রিয় কিন্তু দাদুর বেলায় মাটিকে ভালোবাসার কথা মিশে আছে বুকভাঙা দুঃখের স্মৃতি। স্ত্রী এবং আপন জনেরা মরে গিয়ে এ মাটিতেই মিশে গেছে। নিজের হাতে প্রিয়জনদের তিনি মাটির তলে কবর দিয়েছেন। মাটি ছুঁলে তিনি যেনো তাদের স্পর্শ অনুভব করেন। তাই মাটিতে বুক ঠেকিয়ে প্রিয়জনদের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন দাদু। নাতিকে তাই বলছেন, হয়তো তার সঙ্গে গলাগলি করে মাটিতে বুক দিয়ে কাঁদলে একটু শান্তি পাবেন তিনি। মাটিকে তাই এতো ভালোবাসেন দাদু। এ মাটিই যে তার সুখ ও দুঃখের সঙ্গী।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দাদুর প্রিয়জনদের আর কে কে তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে তাদের কথা লিখতে পারবেন।
- দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর মৃত্যুতে যে শোক পেয়েছিলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
বাপজি – বাবা, কোথাও কোথাও সম্বোধনের সঙ্গে 'জি' ব্যবহারের চলন আছে। যেমন, বুজি (বুবু+জি=বুজি)।	এখানে তোর বাপজি ঘুমায় এখানে তোর মা,
বা-জান – বাবাজান বা বাপজান, 'জান' এখানে আদর ও সম্মান সূচক শব্দ।	কাঁদছিস তুই? কি করবি দাদু! পরাণ যে মানে না।
পরান – প্রাণ, এখানে 'মন' অর্থে ব্যবহৃত।	সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
সপ – বিশেষ ধরনের লম্বা ও	"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।"
	ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম, "বাছা শোও"
	সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
	গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
	তুমি যে কহিলা, 'বা-জানরে মোর কোথা যাও, দাদু লয়ে?
	তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,

মোটা ঘাস দিয়ে তৈরি মাদুর।

গোর – কবর।

ফাল্গুনী হাওয়া – ফালগুন মাস হলো বসন্ত কাল, সেই সময়ের হাওয়া।

গেঁয়ো – গ্রামের।

আথালে – গোহালে (আথাল আঞ্চলিক শব্দ, পল্লী কবিদের রচনায় পাওয়া যায়)।

নাহি – গোসল করে।

গহীন – গভীর সাগর।

আন্ধার – আঁধার।

মরণ-বিষের তাজ – মরণকে এখানে বিষ বলা হয়েছে। তাজ হলো মুকুট, যা মাথায় পরা হয়। মাথায় বিষের মুকুট পরলে তাকে নিশ্চয় মরতে হবে। কবিতায় শব্দ তিনটির ব্যবহারে মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যও হয়ে উঠেছে কাব্যময়।

অভাগিনী – যে মহিলার ভাগ্য খারাপ।

মরিবার কালে – মরার সময়।

গন্ড – গাল।

আশিষ – আশীর্বাদ/দোয়া।

ক্ষণপরে – একটু পরে।

মাথাল – খড় বাঁশের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছাতা বিশেষ। গ্রামের কৃষকেরা হাতে তৈরি ছোটো এ ছাতা মাথায় টুপির মতো করে পরে। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়। এটি আঞ্চলিক শব্দ।

তরু-ছায় – গাছের ছায়ায়।

জোনাকী – ছোটো পোকা, যার গায়ের আলো রাতে স্পষ্ট দেখা যায়।

ঝিঁঝিঁ – এক ধরনের পোকা, তাদের ডাকে ঝিঁঝি শব্দ হয়।

নূপুর – পায়ের অলঙ্কার যা রুম ঝুম শব্দ সৃষ্টি করে।

সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, 'বাছারে যাই,
বড় ব্যথা রোল দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।'
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন জলে
কি জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল– 'আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথাল খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।'
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁ ঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, 'রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।'

ঘুমের নূপুর – বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে ঘুম পাড়ানী গান। ঝিঁঝি পোকার শব্দকে এখানে ঘুম পাড়ানী বাজনা বলা হয়েছে। যে বাজনা শুনলে হয়তো ঘুম আরও গাঢ় হয়। খুবই কাব্যিক প্রয়োগ হয়েছে শব্দ দুটির।	

ভাবসংক্ষেপ

নাতির কাছে দাদু নিজের ছেলে ও ছেলের বৌ অর্থাৎ নাতির বাবা ও মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন। হঠাৎ করেই ছেলে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। নাতি তখন ছোটো। কাফনে ঢাকা লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে দাদু বোবা হয়ে যান। অবুঝ শিশুকে শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুর ধারণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃত্যু যে কত বেদনার এবং কত নিষ্ঠুর বাস্তব, তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাননি দাদু। স্বামীর শোক পুত্রবধূ সহ্য করতে পারলো না। স্বামীর লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে এবং বলদের গলা ধরে দিনরাত শুধু কাঁদতো। এমনই করুণ সে কান্না যে মনে হতো গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। পথিকের চোখ ভিজে ওঠে। অবশেষে শিশু পুত্রকে রেখে অকালেই সে চিরবিদায় নিলো। মৃত্যুর সময় শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেছিলো স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সে মাথাল পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু দাদুর মনের ব্যথার মরণ নেই। নাতিকে তার বাবা মার জন্য দোয়া করতে বলেন দাদু। অসহায় মানুষ আর কিই বা করতে পারে। দোয়া করাই তার শেষ সান্ত্বনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দাদুর ছেলে কিভাবে মারা গেলো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. স্বামীর মৃত্যুতে দাদুর পুত্রবধূর শোকের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন সংক্ষেপে লিখুন।

৩. পুত্রবধু মৃত্যুর সময় শিশুপুত্রকে কী বলেছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. টীকা লিখুন

মরণ-বিষের তাজ, ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর, চোখের জলের গহীন সায়র।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : স্বামীর মৃত্যুতে দাদুর পুত্র বধূর শোকের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়ে। কিছুতেই এ শোকে সে বহন করতে পারছিল না।

স্বামীর স্মৃতিমাখা লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে ধরে সারাক্ষণই সে কাঁদতো। কখনো গোহালের বলদ দুটোর গলা ধরে অঝোরে কাদতো। চোখের জলে সারা শরীর তার ভিজে যেতো। জীবন তার কাছে অসহ্য মনে হতো। তার করুণ কান্না শুনে পথিকেরাও চোখ মুছতো। গাছের পাতারাও যেনো ঝরে যেতো। মানুষের ব্যথাকে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অসাধারণ কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কবি। অবশেষে অকালেই পুত্রবধূ মৃত্যুবরণ করে। রোগে নয়, শোকেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যু যেন সে আদর করে মাথায় তুলে নিলো।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দাদুর নাতনির মৃত্যুর বিবরণ লিখতে পারবেন।
- শ্বশুর বাড়ির অনাদর নাতনিকে কেমন করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মতন – মতো। **বনিয়াদি ঘর** – ভালো বংশের পরিবার। **শত যে মারিত ঠোঁটে** – ঠোঁটে বলতে এখানে 'কথা' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কর্কশ, শক্ত এবং কষ্টদায়ক কথাকে কবি ঠোঁটের মার বলেছেন। **কসাই** – পশু হত্যা করে মাংস বিক্রি করা যাদের পেশা। **চামার** – চামড়ার কাজ করা বা জুতা সেলাই করা যাদের পেশা। **সোনা মুখ** – সুন্দর মুখ। **মরণ-বীণ** – মৃত্যুর সুর। **পচানো জ্বর** – লাগাতার জ্বর, কোনো সময় যে জ্বর ছেড়ে যায় না। **হতভাগিনী** – যার ভাগ্য খারাপ। **ব্যথাতুরা** – বেদনায় কাতর।	এখানে তোর বুজীর কবর, পরীর মতন মেয়ে, বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে। এত আদরের বুজীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে। খবরের পর খবর পাঠাত, দাদু যেন কাল এসে দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে। শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে। সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি, কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি। বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন, কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ বীণ! কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে, এ খানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে। ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো, কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো। বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন, পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ। হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্, দাদু! আয় খোদা দয়াময়! আমার বুজীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।'

ভাবসংক্ষেপ

দাদু তার নাতির বড় বোন অর্থাৎ বু-জীর অসুখি জীবনের গল্প বলছেন। কাজী বংশের ভদ্র পরিবারে বিয়ে হলেও শ্বশুর বাড়িতে কেউ বু-জীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো না। কর্কশ কথা এবং কটু বাক্যে তার জীবন দুঃসহ করে তুলতো ওরা। সে তাই বার বার দাদুকে অনুরোধ জানাতো, বাপের বাড়িতে দুচার দিনের জন্য তাকে যেনো নিয়ে যায়। সহজে বু-জীকে কসাই শ্বশুর আসতে দেয়নি। অনেক বলা কওয়ার পর একবার দাদু তাকে আনতে পারলো। পরীর মতো সুন্দর চেহারা শোকে দুঃখে কষ্টে মলিন হয়েছে দেখে দাদু বড়ই কষ্ট পেলেন। বু-জী হাসতো না, সারাদিন বাপ-মার কবরের কাছে বসে শুধু কাঁদতো। হঠাৎ একদিন জ্বর এলো। সে জ্বর আর ভালো হল না। বু-জীও দাদুকে ছেড়ে মৃত্যুর দেশে চলে গেল একদিন। দুঃখিনী বু-জীর জন্যও দাদু নাতিকে দোয়া করতে বলছেন। এ পৃথিবীতে সে সুখি হয়নি, পরলোকে যেন সে বেহেশতবাসী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বু-জীর শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেমন ছিলো, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে তার বর্ণনা লিখুন।

২. বু-জীকে হতভাগিনী বলেছেন কেন দাদু, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

৩. টীকা লিখুন :

কসাই, চামার, শত যে মারিত ঠোঁটে, পচানো জ্বর, ব্যথাতুরা হতভাগিনী।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : বু-জীকে হতভাগিনী বলেছেন কেনো দাদু, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর আদরের নাতনি মানে বু-জী ছিল পরীর মতো সুন্দর। বিয়েও হয়েছিলো ভালো বংশের পরিবারে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছিলো বড়ই নির্দয়। বু-জীর সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করতো। বাপের বাড়িতে আসতে দিতো না। সে জন্য বু-জী কতো যে কাঁদতো। একে তো বাবা মা মরা এতিম মেয়ে, তার ওপর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ভালোবাসেনা। দাদুর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মনটা তার আকুল হতো। অল্প বয়সেই পৃথিবীর কঠিন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বেঁচে থাকার সাধ ঘুচে যায়। অবশেষে জ্বরে ভুগে-ভুগে দয়ামায়াহীন পৃথিবী ছেড়ে সে চলে যায় মৃত্যুর দেশে। কোনো দিক দিয়েই তার ভাগ্যে সুখ হয়নি। তাই দাদু তাকে হতভাগিনী বলে মনের দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- দাদুর জীবনের চরম দুঃখের কথা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে পারবেন।
- প্রিয়জনদের হারানো কাহিনী বলতে গিয়ে দাদু শোকে কত কাতর হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
হেথায় – এখানে। **রামধনু** – রঙধনু। **সদা** – সব সময়। **যবে** – যখন। **চেয়ে** – দেখে। **চোখের ধারা** – চোখের পানি। **গেনু** – গেলাম (আঞ্চলিক শব্দ)। **দংশন** – কামড়। **প্রতিমা** – মূর্তি, (এখানে মেয়েকে প্রতিমা বলা হয়েছে)। **ঘুম ভোলা** – সহজে যাদের ঘুম	হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে, রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে। ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা, অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা! ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে, তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত চেয়ে। বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা, রঙিন সাঁজেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

ভেঙে যায়। **দীন দুনিয়ার** – ইহ জগতের। **আবীরের রাগে** – উৎসবের রঙে। **মজীদ** – মসজিদ (আঞ্চলিক শব্দ)। **জীবনের রোজ কেয়ামত** – জীবনের শেষ বিচারের দিন, এখানে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। **জোড়হাতে** – দুই হাতে। **মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ** – মৃত্যু যাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ যারা এখন মৃত।	একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে, ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে। সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে। কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে। আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি, দাদু! ধর–ধর–বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি। এখানে এ কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু, কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুমভোলা মোর যাদু। আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে, দীন দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে। ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে, অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে। মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর, মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর। জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান। ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।"

ভাবসংক্ষেপ

দাদুর করুণ গল্প এখানে চরম দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি ছোট মেয়ের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। সাত বছরের মেয়েটি ছিলো অবিকল মায়ের মতো দেখতে। তাকে বুকে ধরে দাদু স্ত্রীর শোক ভুলতে চাইতেন। সাপের কামড়ে সেও চলে গেলো মৃত্যুর দেশে। কবে আসবে তাঁর জীবনের শেষ দিন সে কথা ভাবছেন। এতো ব্যথা মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং নাতি দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছেন- আল্লাহ যেনো সবাইকে বেহেশত নাজেল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দাদুর ছোটো মেয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রিয়জনদের হারিয়ে দাদুর মনের অবস্থা শেষে কেমন হয়েছে, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

২. দাদু 'দীন দুনিয়ার ভেস্ত' কাকে বলেছেন, সে কোথায়; সংক্ষেপে লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : দাদুর ছোটো মেয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রিয়জনদের হারিয়ে দাদুর মনের অবস্থা শেষে কেমন হয়েছে, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর ছোটো মেয়ে খুব সুন্দর। যেন সোনার প্রতিমা। গোল গাল হাত, ফুলের মতো মুখ, ঠিক মায়ের মতোই ছিলো তার চেহারা। দাদুর চোখে সে ছিলো আকাশের রঙধনুর মতো মন আলো করা চেহারার মেয়ে। সে যেন পৃথিবীর কেউ নয়। যেন 'ভেস্তের' দরজা দিয়ে নেমে এসেছিলো তাঁর ঘরে। অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে মেয়েটি বিষণ্ন হয়ে থাকতো। কি যেন ভাবত সর্বদা। মনের দুঃখের কথা প্রকাশ করার ভাষাও তার ছিলো না। কিন্তু দাদু বুঝতেন মাতৃহীন মেয়ের মনের ব্যথা। তাই তাকে বুকে নিয়ে খুব আদর করতেন। মায়ের অভাব দূর করতে চাইতেন মন উজাড় করা মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে। সোনার প্রতিমাকে তবু তিনি বেঁধে রাখতে পারলেন না।

প্রশ্ন : দাদু 'দীন দুনিয়ার ভেস্ত' কাকে বলেছেন, সে কোথায়; সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : 'কবর' কবিতার প্রধান চরিত্র দাদু। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ভরা ছিলো তাঁর সংসার। সুখের অন্ত ছিলো না। কিন্তু কপালে সুখ সইলো না। একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো অকালে। স্ত্রী মারা গেলো, সামান্য জ্বরে ভুগে হঠাৎ ছেলেও মারা গেলো। স্বামীর শোকে কাঁদতে কাঁদতেই পুত্রবধূ মারা গেলো কিছুদিনের মধ্যে। শিশুপুত্রের মায়াও তাকে ধরে রাখতে পারলো না। শ্বশুর বাড়ির যন্ত্রণা এবং অত্যাচারে নাতনিটাও জীবনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো। জ্বরে ভুগে ভুগে মায়া গেলো। দাদু ছোটো মেয়েকে বুকে নিয়ে সব ব্যথা ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাপের কামড়ে সেও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলো। বুক ভেঙে খান খান হয়ে গেলো দাদুর। প্রিয়জনদের কথা মনে করে কাঁদতেন আর মৃতদের জন্য দোয়া চাইতেন আল্লাহর কাছে– তারা সবাই যেনো বেহেশতবাসী হয়। জীবনের অবলম্বন একমাত্র নাতির কাছে তিনি বলেন, এবার মৃত্যু আসুক। আর সহ্য হয়না শোক। দাদুর এ অবস্থা পাঠককেও শোকাতুর করে তোলে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'কবর' কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় লিখুন। 'কবর' কবিতার নাম কতটুকু সার্থক হয়েছে?

২. 'আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু, উজান-তলীর গাঁ' –কথাটি কে বলেছেন, কাকে বলেছেন সংক্ষেপে ঘটনাটির বর্ণনা লিখুন।

৩. নাতির কাছে দাদু তার বাবা ও মায়ের মৃত্যুর যে কাহিনী বলেছেন, সংক্ষেপে তার বিবরণ লিখুন।

৪. ব্যাখ্যা লিখুন :

ক. তারপর এ শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।

খ. তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেলো মুখে, সারা দুনিয়ার যতো ভাষা আছে কেঁদো ফিরে গেলো দুখে।

গ. সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে, পরানের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

ঘ. এতো আদরের বু-জীরে তারা ভালোবাসিত না মোটে, হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : 'কবর' কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় লিখুন। 'কবর' কবিতার নাম কতটুকু সার্থক হয়েছে?

উত্তর : কবি জসীমউদদীন রচিত 'কবর' একটি অসাধারণ কবিতা। গ্রামীণ পরিবেশে কোনো এক দাদু তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শোনাচ্ছেন নাতিকে। দাদুর বর্ণনায় পুরো পরিবারের লোকজনের চরিত্র এবং তাদের চেহারা পর্যন্ত

জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে। কবির ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন - বাপজি, বা-জান, সপ, আথাল, মাথাল, বু-জী, ভেস্ত, মজীদ, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে গ্রামীণ জীবন এবং আচার আচরণের সহজ সরল দিকগুলো ছবির মতো ফুটে ওঠে। পুরো কাহিনীর মধ্যে যে প্রকৃতির বর্ণনা কবি দিয়েছেন যেমন, ঘুঘুর ডাক, জোনাকীর আলো, ঝিঁঝি পোকার শব্দ, গাজনার হাট, উজানতলীর গাঁ, শাপলার হাট, ইত্যাদির সঙ্গে দাদুর চরিত্র চমৎকারভাবে মিশে গেছে।

কবিতার প্রধান চরিত্র দাদু। তাঁকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁর সংসার ছিল সাজানো বাগানের মতো। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, লাঙল, জোয়াল, বলদ সবই ছিল তাঁর। সুখের সংসারে পুতুলের মত সুন্দরী বউ-এর আন্ত রিক ভালোবাসায় দাদুর জীবন কানায় কানায় ভরা ছিল। কেউ কাউকে ছেড়ে দু চারদিনও দূরে থাকতে পারতেন না। এমন গভীর এবং পবিত্র মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে দাদি চলে গেলেন মরণের দেশে। ডালিম গাছের নিচে সেই কবরের কাছে যখনই দাদু বসেন তখনই দুই চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়। তিরিশ বছর ধরেই দাদুর চোখের পানি পড়ছে স্ত্রীর কবরে। নাতিকে তাই বলেছেন- 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'।

প্রিয়তম স্ত্রীর অভাবে জীবন তাঁর শূন্য হয়ে গেলে ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিদের নিয়ে জীবনের দিনগুলো কাটাতে চেয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বিধান ছিলো অন্যরকম। তাই জোয়ান ছেলে মাত্র কদিনের জ্বরে মারা গেলো। স্বামীর শোকে দাদুর পুত্রবধূ এতই কাতর হলো যে দিনরাত কাঁদতে কাঁদতেই জীবন ক্ষয় করলো। বিধবার জীবন সে আর সহ্য করতে পারলো না। শিশু পুত্রের মায়া ত্যাগ করে সেও চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। পুত্র এবং পুত্রবধূর কবর হল পাশাপাশি। দাদু তাদেরকে 'জোড়মানিক' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের ভালোবাসা এতই গভীর ছিলো, যে মরণের দেশেও তারা পাশাপাশি থাকার সুযোগ পেলো।

বাপ মা মরা নাতনিকে দাদু বড়ই আদর করতেন। ভাল বংশ দেখে বিয়েও দিলেন তার। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ছিলো নিষ্ঠুর। নাতনির সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করতো। নাতিকে বলছেন দাদু –'শ্বশুর তাহার কসাই চামার' মনের দুঃখে পরীর মতো মেয়েটি জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। হতাশায় তার জীবনী শক্তি এতোই কমে গিয়েছিলো যে জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। সেই জ্বরেই তার মৃত্যু হলো।

দাদুর ছোটো মেয়ের চেহারা ছিলো ঠিক তার মায়ের মতো। বড়ই আদর করতেন তাকে দাদু। জীবনের দুঃখ কষ্ট সব সহ্য করতেন 'সোনার প্রতিমা'-র দিকে চেয়ে। জগৎ আলো করা সেই চেহারা দেখে দাদুর মনে হতো - 'ভেস্তের দ্বার বেয়ে' সে কৃষকের সাধারণ ঘরে নেমে এসেছে। মা মারা যাওয়ার পর মনমরা হয়ে থাকতো মেয়েটি। কী কষ্ট হতো তার মনে, সে কথা বলারও বয়স ছিলো না তার। একদিন সাপের দংশনে সেও চলে গেল মায়ের কোলে– সেই মৃত্যুর অচিন দেশে।

বাকি রইলো শুধু নাতি। মাঝে মাঝে তার কাছে সবার কথা বলে এবং কেঁদে বুক হালকা করতেন দাদু। কিন্তু তিনিও আর শোকের বোঝা বইতে পারছেন না। কবে এ 'জীবনের রোজ কেয়ামত' আসবে সেই কথা ভাবেন। শূন্য জীবনের হাহাকার এবং বেদনায় তিনি মৃত্যু কামনা করছেন। স্নেহ মমতায় কোমল দাদুর মন। হারানো প্রিয়জনদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করেন আল্লাহর কাছে - তারা যেনো বেহেশতবাসী হয়। নাতিকেও তিনি এই প্রার্থনা করতে শেখান।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

খ. 'তোমার কথার উত্তর ---------- গেলো দুখে'।

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতা থেকে লাইন দুটি নেয়া হয়েছে। দাদু যখন ছেলের কাফন পরানো লাশ কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাতি প্রশ্ন করেছিলো – 'বা-জানরে মোর কোথা যাও লয়ে দাদু'? দাদুর মুখে তখন কথা জোগায়নি। মৃত্যু কী, ছোটো শিশু তা বোঝেনা। সে বোঝেনা কেনো মানুষকে কাফন পরানো হয়। বোঝেনা, কাফন পরানোর পর মানুষকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু একথাও বোঝেনা যে একবার এ পোশাক

পরিয়ে যে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়, সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না। চিরদিনের মতো সবাইকে ছেলে সে চলে যায় মরণের দেশে, অচিন ঠিকানায়। কোনো জীবিত মানুষ সেখানে যেতে পারে না।

পুত্রশোকে কাতর পিতার বুক ভেঙে যাচ্ছে এ সত্যগুলো মেনে নিতে। কিন্তু মৃত মানুষকে ধরে রাখারও তো কোনো উপায় নেই। তাকে বিদায় দিতেই হয়। পুত্র শোকে কোনো সান্ত্বনা নেই। আমৃত্যু এ শোকে পিতার হৃদয়ে আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে। কিন্তু এসব কথা নাতিকে কেমন করে বোঝাবেন দাদু? সব জেনে এবং বুঝেও তাই তিনি উত্তর দিতে পারেন না অবুঝ শিশুকে পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে পুত্র শোকের করুন ব্যথা সম্পর্ণ প্রকাশ করা যায়। ঠিক তেমনি এমন কোনো ভাষা পৃথিবীতে নেই যা দিয়ে শিশু পুত্রকে পিতার মৃত্যু যে কতো মর্মান্তিক তা বোঝানো যায়। এটা এমনই দুঃখ যে বলতে গেলে ভাষাও দুঃখ পায়, ভাষাও কাঁদে। এ লাইনে কবির অসাধারণ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

গ. সেই যে মাথাল পরিয়া গলিয়া ..... ওঠে ক্ষণে ক্ষণে'।

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতা থেকে লাইন দুটি নেয়া হয়েছে। পুত্রবধুর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে দাদু মাথালের কথা বলছেন নাতিকে।

পুত্রবধূ কোনো রোগে মারা যায়নি। স্বামীর শোকই তার কাল হয়েছিলো। স্বামীর অভাব সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। প্রিয় মানুষের লাঙল-জোয়াল এবং কখনও গোয়ালের বলদের গলা ধরে সে নিরন্তর কাঁদতো। এভাবে ক্রমে শরীর ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলো। জীবন ধারণ তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। মৃত্যুর সময় শ্বশুরকে অনুরোধ করেছিলো, স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। দাদু তার অনুরোধ রেখেছিলেন।

তারপর কেটে গেছে দিন মাস বছর। রোদ বৃষ্টিতে খড়ের মাথাল গলে পচে মাটির সঙ্গে সঙ্গে মিশে গেছে। পুত্রবধুর কবরে মাথালের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দাদুর মনে সব স্মৃতি আজো জ্বলজ্বল করছে। কিছুই মন থেকে মুছে যায়নি। মন তো দেখা যায় না, তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না শোকের আগুনে কেমন করে বুক পুড়তে থাকে। শোকের স্মৃতি দিনরাত মনের ভেতর কি জ্বালা সৃষ্টি করে। দাদু নাতিকে তাই বলছেন যে শোকের প্রতীক মাথাল আর দেখা যায় যা বটে কিন্তু মনের শোক প্রতি ক্ষণে তিনি দেখতে পান। অনুভব করেন প্রিয়জনের ব্যথা। সে ব্যথার পচন নেই, মরণও নেই।

ভাষার বিষয়ক প্রশ্ন

১. 'কবর' কবিতায় অনেক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কবিতা থেকে দশটি শব্দ বের করে তার অর্থ লিখুন।

উত্তর

আথাল –	গোয়াল
মাথাল –	খড় বাঁশ দিয়ে তেরি ছাতার মতো জিনিস, রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাথায় পরা হয়।
ভেস্ত –	বেহেশত।
বু-জী –	বড়ো বোনকে সম্বোধন করা হয়; 'জী' এখানে সম্মানসূচক প্রত্যয়।
বাপজি –	বাবাকে সম্বোধন করা হয়; 'জি' (বানান ভেদে 'জী') এখানে সম্মান সূচক প্রত্যয়।
বা-জান –	বাবাজান, সংক্ষেপে বা-জান, 'জান' আদর সূচক প্রত্যয়।
গেনু –	গেলাম।
মজীদ –	মসজিদ।
মোর –	আমার।
দিনমান –	দিন; 'মান' এখানে প্রতিশব্দ, অর্থ প্রকাশের জন্য নয় – ছন্দের জন্যই এমন অর্থশূন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কবিতা থেকে দশটি আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে তার চলিত রূপগুলো পাশাপাশি লিখুন।

উত্তর

আঞ্চলিক রূপ	চলিত রূপ
জড়ায়ে	জড়িয়ে
ঘুমায়ে	ঘুমিয়ে
নাওয়ায়ে	নাইয়ে
বিছায়ে	বিছিয়ে
সাজায়ে	সাজিয়ে
হারায়ে	হারিয়ে
ভিজায়ে	ভিজিয়ে
লুটায়ে	লুটিয়ে
দেখিতিস	দেখতি
মিশায়ে	মিশিয়ে

৩. ছন্দ মেলানোর জন্য মাঝে মাঝে চলিত ও সাধু রীতির যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ও সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে; কয়েকটি নমুনা লিখুন।

উত্তর :

কেঁদে ভাসাইত = চলিত + সাধুরীতি
ছুটে যাইতাম = চলিত + সাধুরীতি
দেখে লইতাম = চলিত + সাধুরীতি
এসে কহিল = চলিত + সাধুরীতি
ডেকে কহিল = চলিত + সাধুরীতি
কেদে হইতাম= চলিত + সাধুরীতি

খ)

জড়ায়ে ধরেছি = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
ঘুমায়ে রয়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
লুটায়ে পড়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
কাঁদিয়া কাটাত = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
ভিজায়ে রেখেছি = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
জড়ায়ে রয়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি

৪. কবিতার প্রতি লাইনে বিশ অক্ষরের বাঁধন ঠিক রাখার জন্য কখনো চলিত রীতির যৌগিক ক্রিয়া এবং কখনো সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তর

ক) দেখে যাও = চলিত+চলিত রীতি
কেঁদে মরে = চলিত+চলিত রীতি

চলে গ্যাছে = চলিত+চলিত রীতি
নেমে এসেছিল = চলিত+চলিত রীতি
করে গেলো = চলিত+চলিত রীতি
ফেটে যায় = চলিত+চলিত রীতি

খ) ছাড়িয়া যাইতে = সাধু + সাধুরীতি
ডাকিয়া কহিল = সাধু + সাধুরীতি
কাঁদিয়া উঠিত = সাধু + সাধুরীতি
দেখিতে যাইও = সাধু + সাধুরীতি
ঘুরিয়া ফিরিতে = সাধু + সাধুরীতি
কহিত হাসিয়া = সাধু + সাধুরীতি

দ্রষ্টব্য : কবিতার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে কবির যতো স্বাধীনতা আছে, গদ্যে তা নেই। কবিতার ভাষায় মিশ্র ক্রিয়া ছন্দ ও মাত্রা ঠিক রাখার জন্যই ব্যবহার করা যায়। গদ্যের মিশ্র ক্রিয়ার ব্যবহার রীতি বিরোধী। মিশ্র ক্রিয়া ব্যবহার করলে গদ্যরচনার বাক্য ভুল বলে গণ্য করা হয়। কাব্যে যা ভাষায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, গদ্যে তা দুর্বলতার লক্ষণ। সুতরাং গদ্য লেখার সময় মিশ্র রীতির ক্রিয়ারূপ ব্যবহার না করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

৫. 'কবর' কবিতার প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দে মিল আছে, একে অন্তমিল বলে। উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

[কবিতার লাইন থেকে শেষ শব্দগুলো লিখে অন্তমিলের শব্দগুলো সাজান। তারপর লাইনগুলো জোরে জোরে পড়ে অন্ত মিল লক্ষ্য করুন এবং মনে রাখুন। অন্তমিলের সৌন্দর্য বোঝার চেষ্টা করুন।]

৬. গ্রামীণ জীবনের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য 'কবর' কবিতার ভাষাকে কবি তৈরি করেছেন পরম যত্নে' এ প্রসঙ্গে আপনার মত লিখুন।

[সূত্র আঞ্চলিক শব্দ, আঞ্চলিক সম্বোধন, কৃষক পরিবারের ব্যবহার্য জিনিসের নাম, মিশ্র ক্রিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহার, ইত্যাদির নমুনা দিয়ে উত্তর লিখুন।]

সৃজনশীল কাজ

১. কাব্য দুটি পাঠের সময় আঞ্চলিক শব্দ, অন্তমিলের শব্দ এবং সাধু+চলিত রীতি কিংবা চলিত+ সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়ার শব্দগুলো খুঁজে খাতায় লিখুন। দেখুন তো আপনার অঞ্চলের কোনো শব্দ পান কি না?

২. কয়েকটি আঞ্চলিক গান সংগ্রহের চেষ্টা করুন। আপনার অঞ্চলের গানও সংগ্রহ করতে পারেন। গানের আঞ্চলিক শব্দগুলো বেছে বেছে খাতায় লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।